কুমোরের মেয়ে

পেশায় ব্যাঙ্ক-কর্মী দেবকুমার সোম নেশায় লেখক। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন কিংবদন্তি ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

ইজের পরা বয়সে মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরে জলচৌকিতে আলপনা আঁকতেন। পুজো-পার্বণে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ কিংবা বিয়ে পৈতেয় শ্রী তৈরি তাঁর ছিল প্রিয়। গত শতাব্দীর আর পাঁচটা বাঙালিবাড়ির মেয়ে অপেক্ষায় উন্নত কোনো মেধা ছিল না মীরা মুখোপাধ্যায়ের। ছিল না অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য। কলকাতার বউবাজারের একান্নবর্তী পরিবারে আলপনা, লক্ষ্মীছাপে তার উৎকর্ষতা পারিবারিক বৃত্তের বাইরে আলোচিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। তবু, চোদ্দ বছর বয়সে মীরাকে তাঁর বাড়ির লোকেরা অবন ঠাকুরের ওরিয়েন্টাল আর্ট কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। কারণ ততদিনে কিশোরী মীরার রুচি এবং অনুরাগ পাল্টে গিয়েছে। কিশোরী বয়সে চোখ ফোটার ঋতুতে তাঁর ঝোঁক আসে কাদামাটির প্রতি। কাগজ-পেনসিল, রঙ, মোম, কাঠকয়লা হয়ে ওঠে 'হাতের কাজ'।

ওরিয়েন্টালে তিনি আঠেরো বছর বয়স অবধি ছাত্রী ছিলেন। তারপর ১৯৪১ সালে শিক্ষার ইতি। তখন তাঁর বিয়ের জন্য বাড়ির লোকেরা উদগ্রীব। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে গুরুর কাছে নাড়া বাঁধা। মীরাকে মেনে নিতে হয়েছিল এমন পারিবারিক অনুশাসন। এরপর মীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতা শহরের দাঙ্গার সময় স্বাস্থ্য উদ্ধারের কারণে বোন বিভার সঙ্গে তাঁকে রাজশাহী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জেলা সদর বহরমপুরে পদ্মা পার হয়ে পূর্বদিকে তাঁর যাত্রা। সেই প্রথম দু-কূল ছাপান পদ্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। নদীর খলবল, আর ছুঁয়ে যাওয়া বিবিধ সবুজের প্রেক্ষাপটে নীল আকাশের প্রাদুর্ভাব। শহর কলকাতায় যে আকাশ দেখা হয়নি, যে নদীর উন্মত্ততা ছোঁয়া যায়নি, সেই সব ছুঁলেন জীবনে প্রথম। চোখ মেলে দেখলেন বাংলাদেশের মাটি আর মানুষের সহাবস্থান।

মীরা মুখোপাধ্যায়ের জীবনের কড়ি-কোমলের বিস্তার, মীড়ের সুক্ষ্মতা, বেহাগ কিংবা ভীমপলশ্রী রাজশাহী ভ্রমণ। পরবর্তী জীবনে তিনি যা কিছু সঞ্চয় করেছেন, ব্যয় করেছেন, হারিয়েছেন, সেই সব কিছুর সঙ্গে মিশে গেছে পদ্মার ভাঙন। উন্মাদনা। এবং সৃষ্টিশীলতা। রাজশাহীর যে বাড়িতে তাঁরা থাকতেন, তার দোতলার ছাদ থেকে দূরে রেললাইন দেখা যেত। গাঢ় সবুজ ধানজমির মধ্যে দিয়ে যখন স্টিম এঞ্জিনের ধোঁয়া উড়িয়ে ঝম্ ঝম্ ছুটে যেত রেল, মীরা তাঁর বোনের সঙ্গে এক দৌড়ে ছাদে উঠে বিস্ময়ে দেখতেন। উচ্ছ্বাস আর আহ্লাদে সিক্ত হতেন। ট্রেন তার ধোঁয়া বাতাসে ভাসিয়ে দূরে চলে গেলে মন্ত্রমুগ্ধ মীরা চকখড়িতে ছাদের

দেওয়ালে আঁকতেন নদীর মতো আঁকাবাঁকা ট্রেনের ছবি। আর এইভাবে নিজের ভেতরে চিত্রকর হওয়ার বাসনা বাস্তবিক ডানা মেলত। সত্যি বলতে, মীরা মুখোপাধ্যায় ছবি না এঁকে সঙ্গীতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে কিস্যু বলার ছিল না। হয়ত জীবন জুড়ে 'কুমোরের মেয়ে'র গঞ্জনা সইতে হত না। ক্ষণস্থায়ী বিবাহিত জীবন দীর্ঘায়িত হত। বলা যায় না, মীরা মুখোপাধ্যায় হয়ত হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আইকনিক বাঙালি গায়িকা হওয়ার দুর্লভ সম্মান পেতেন। বোধহয়, সবদিকে সামলে চলতে পারতেন। এভাবে কূলভাঙা নদীর মতো ছুটে যেতেন না সাগরসন্ধানে। কিন্তু রাজশাহী ভ্রমণ তাঁর জীবনের পূর্বাপর গতিমুখ পাল্টে দিল।

রাজশাহীতেই সেই কুমোরের সঙ্গে তাঁর দেখা। অসুস্থ তিনি বিছানায় শুয়ে পাশের বাড়ির বিহারি কুমোরের কাজ দেখতেন নিবিষ্ট মনে। লোকটা সারাদিন রোদে পুড়ে এক নাগাড়ে কাদামাটির তাল বানিয়ে ঘুর্ণিতে মাটির জিনিস তৈরি করত। কাঁচামাটির সেই সব খুড়ি, বাটি, কলসি, কুঁজো প্রথমে খানিক রোদে শুকাত, তারপর মুচি তৈরি করে আগুনে পুড়িয়ে নিত। লোকটার শরীরের মাংসপেশি, গলার রগ, চোখের দৃষ্টি নির্নিমেষ দেখতেন মীরা। কাদামাটির তাল যত তৈরি হত, তার থেকে বাসন তৈরি করতে গেলে কিছু নষ্ট হত। তারপর কাঁচামাটির বাসন রোদে শুকিয়ে পুড়িয়ে নিতে গেলে অতিরিক্ত আগুনের তেজে কিছু যেত ভেঙে। লোকটা সে-সবে দুঃখিত হত না বিশেষ। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়শি বামুনবাড়িতে সদ্য আসা মেয়েটিকে দেখত। কখন হাসত। এভাবে দুই অসমবয়সীর মধ্যে তৈরি হয় সখ্যতা। অসুস্থ মেয়েটি জানতে চায় মাটির আত্মাকে। বুড়ো কুমোর তার গ্রাম্যভাষ্যে যতটা পারে বুঝিয়ে দেয়। ক্রমে বুড়ো কুমোর তাঁকে 'মেয়ে' বলে সম্বোধন করে। মীরা খানিক সুস্থ হলে হাতে ধরে শিখিয়ে দেয় মাটির রহস্য ভাঙার গায়ত্রী মন্ত্র।

শহরে দাঙ্গা মিটলে ফের রাজশাহী ছেড়ে মীরাকে ফিরতে হয় বউবাজার। তবে, সে ক্ষণিকের। এরপরে বউবাজারের 'খুকি'র জীবন ভেসে যায় পদ্মা-গঙ্গার পারে। দেশভাগের বছরে মীরার বিয়ে আর সেই বছরেই স্বামীকে ত্যাগ করে তিনি বেড়িয়ে পড়েন মাটি আর ধাতুর সন্ধানে। দিল্লি পলিটেকনিকে ভর্তি হন। পেন্টিং, গ্রাফিক্স আর স্কাল্পচারে ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরে আসা শান্তিনিকেতন। তারপর জার্মানি। আর জার্মানি গিয়েই বনে গেলেন পুরোদস্তুর ভাস্কর। ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী জীবনে যিনি বললেন : 'ধাতু দিয়ে গান গেয়েছি আমি।'

ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে অলিখিতপূর্ব কোন নিবন্ধ লেখার সাধ্য আমার নেই। সদ্য তরুণকালে তাঁকে বার কয়েক

দেখেছি কলেজ স্ট্রীটের ‘কাগজের বাঘ’এর বিবিধ অনুষ্ঠানে। যেমন দেখেছিলাম সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, হিরণ মিত্র, গৌর ক্ষ্যাপাকে। কিন্তু সেই সাক্ষাৎ তেমন স্মৃতিধার্য নয় বলেই অবিবেচিত। এর অনেক পরে মীরা মুখোপাধ্যায়কে জানতে চেয়েছি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। একান্ত নিভৃত আয়োজনে। আর সেই জানা-চেনার মধ্যে আমি বুঝতে চেয়েছি শিল্পী হিসেবে তাঁর সংকট। তাঁর শিল্পী জীবনের উদ্দেশ্য।

মীরা মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক জীবনে যদি একবার চোখ ফেলা যায়, তবে আমরা দেখতে পাব সেখানে কোনো উৎপাত ছিল না। ছিল না বেঁচে থাকার কিংবা অস্তিত্ব রক্ষার কোনো সংঘর্ষ। তাঁর অগ্রজ রামকিংকরের মতো মীরার না ছিল পারিবারিক অর্থ সমস্যা, তিনি না ছিলেন ‘নীচু জাত’ হিসেবে সমাজে ব্রাত্য। তাঁর পরিবারটি ছিল বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণ। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বাংলাদেশে কুলীনদের প্রভাব-প্রতিপত্তির নজির আমাদের সাহিত্যে মণিমুক্তো হয়ে আছে। উঁচু আর নীচু জাতের মধ্যে সেকালে ছিল দুস্তর এক তফাৎ। পারাবারের মতোই ছিল সেই দূরত্ব। তার ওপর পরিবারটির বাস শহর কলকাতার বউবাজারে। নগরের অন্যতম রহিস পাড়া। কলেজ স্ট্রীটের কেতা, শিক্ষা, সংস্কৃতির হাতায় ছিল জীবন যাপন। মীরা মুখোপাধ্যায় এক যৌথ পরিবারের কন্যা-সদস্য। ফলে, তাঁর পক্ষে বউবাজারের বাগানঘেরা বাড়ির পাঁচিল টপকে বৃহত্তর জীবন ছোঁয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই ঘেরাটোপের জীবন সপাটে ছুঁড়ে ফেলে পরবর্তী জীবনে তিনি ঘাড়ুয়াদের সঙ্গে মিশে গেলেন। বস্তারের রুক্মিণী বাঈ হল তাঁর আর এক ‘মা’। মাটির মানুষের সঙ্গে জীবন-যাপনের দুর্নিবার টানে ভেসে গেল তাঁর বিবাহিত জীবন। ভেসে গেল আটপৌড়ে বঙ্গজীবন। যে জীবনে বাতাসে ভাসে জমাকুসুম তেলের গন্ধ। জীবনের কাটাছেঁড়ায় ব্যবহৃত হয় সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম। বরং, রুক্ষ হল জীবন। ঠোঁটে উঠল চুট্টা কিংবা শ্রমিকের বিড়ি। হাঁড়িয়া কিংবা দেশি মদের সুঘ্রাণ ভাসিয়ে দিল জীবনের ছোট বড়ো খ্যাতি কিংবা সম্মাননা।

এইখানে তাঁর সঙ্গে রামকিংকরের দ্বিমাত্রিক মিল আমি খুঁজে পাই। তবে তৃতীয় মাত্রায় এক ফারাক থেকে যায়। রামকিংকর বারবার নীচু থেকে উঁচু জাতের সোপানে পা রাখতে গিয়ে পিছলে গেছেন। যতবার হয়েছে পদস্খলন, ততবার ডুবে গেছেন আরও শ্রমজীবনে। অন্যদিকে মীরা উচ্চজাতের চামড়া ছাড়িয়ে নিজেকে অন্তজ-জীবনের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন। জেনেছিলেন জীবনের ছোট-বড় কাটা-ছেঁড়ায় সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম নয়, বনচাঁড়ালের রস কাজ দেয় ধন্বন্তরির মতো। আর তাঁর যে এই উপলব্ধি, তা ওই প্রথমবারের রাজশাহী ভ্রমণের কালে স্থির হয়ে গেছে। নিঝুম দুপুরে চারপাশ যখন উদাসীনতায় ক্লান্ত। নিস্তব্ধ। বিশ্রাম্ভারে প্রতিবেশ। তখন ঝম্ ঝম্ ছুটে যাওয়া ট্রেনের ছবি তিনি আঁকছেন ছাদের পলেস্তরাহীন দেওয়ালে। সে এমন এক সময়, যখন তাঁর গুরুজনদের নির্দেশে চলছে তাঁর নিয়মিত গীতাপাঠ, বাঁধা ওস্তাদের কাছে হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের তালিম। আর কয়েক ঋতু পরেই প্রতিষ্ঠিত কোনো সফল পুরুষের তিনি হবেন জীবনসঙ্গিনী। অবন ঠাকুরের পাঠশালায় আর পাঁচজন সাধারণ শিক্ষার্থীর চেয়ে তাঁর স্থান উঁচুতে ছিল না নিশ্চিত। তখন বরং রং-তুলিতে

জার্ঢ্যতা এসেছে। আর পাল তুলেছে সঙ্গীত মোহ। অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত জীবন-যাপনের কোন ত্রুটি ছিল না সেখানে। অথচ, এত প্রলোভন সত্ত্বেও মীরা মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় তিনি 'কুমোরের মেয়ে'।

রাজশাহীর এক বিহারি কুমোরের ঘরে এই কুলীন বামুনের মেয়েটির নবজন্ম হয়। তিনি পেয়ে যান পদ্মার বাড়-বাড়ন্তের কার্যকারণ। জেনে ফেলেন একাবেঁকা ট্রেনলাইন আর নীল আকাশের সমীকরণ সূত্র। তাই তাঁর ইন্দোনেশিয়ান শিক্ষক এফেন্দি, জার্মানির গুরুকুল তাঁকে যা শিখিয়েছেন, সে-সবের ব্যকরণসম্মত প্রয়োগ ডোকরা শিল্পে রেখে গেলেন তিনি। তাঁর অনন্যতা এই, আজ প্রায় প্রতিটি ভাস্কর, যারা ভারতীয় লোকশিল্পকলা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল, উৎসুক, যাঁরা নিজেদের কৃতকর্মের স্বাক্ষর রাখছেন ধাতুকলায়, তাঁরা জীবনের কোনো না কোনো বিশেষ মূহুর্তে ডোকরা শিল্পে নিজেদের সৃষ্টি রেখে যাচ্ছেন। অর্থাৎ বলার কথা এই যে, ভারতীয় লোকভাস্কর্যকে যারা আন্তর্জাতিক করেছেন, তাঁদের মধ্যে মীরা মুখোপাধ্যায় অগ্রজ বলেই বিবেচিতা। তাই লোকজীবনকে চিনতে চেয়ে বউবাজারের বাগানঘেরা বাড়ির পাঁচিল টপকে তিনি যদি 'কুমোরের মেয়ে' তকমা পান, তা ভাস্কর্য চিত্রকলার ইতিহাসে গৌরবময় উলম্ফন হিসেবেই বিবেচিত হবে।

চিত্র পরিচিতি : ১। শিল্পী মীরা মুখোপাধ্যায়; ২। বাল্মিকী; ৩। বুদ্ধ (জীবনের শেষ কাজ)
যন্ত্র-কোলাজ-চিত্র নির্মান : ব্যাটন।